অনন্য ছৌ শিল্পী পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়া

গম্ভীর কুমার

বাঘমুণ্ডীর রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ। গাজনের মেলা বসেছে সপ্তাহব্যাপী। আজ ষষ্ঠ রজনী। লোকে লোকারণ্য; তিল ধারণের জায়গা নেই। জানা অজানা বনফুলের জাল - লতাপাতা দিয়ে অতি মনোরম সজ্জায় সাজানো। ক্ষেত্রমোহন সিং ডবল ব্যারেলের বন্দুক হাতে পাত্র-মিত্র সহযোগে এসে বসলেন আসরের পাশে চেয়ারে, আদেশ দিলেন অনুষ্ঠান শুরু করার।

শুরুতেই একজন শিল্পী পরিবেশন করলেন ঝুমুরের সুরে রং, তারপর ঐ সুরে বেজে উঠল সানাই। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল ধামসা - করতালের গুরুগম্ভীর শব্দে কেঁপে উঠল চতুর্ভিত, মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত কোলাহল। অনতিপরে একটি সাদা মুখোশে মুখ ঢেকে সাজপোষাক পরে দুই হাতে দুটি রুমাল নিয়ে আসরে ঢুকে পড়লেন একটি ১৪-১৫ বছরের কিশোর। নাম তার 'বাবু'। ঢুকেই রাজার দিকে মুখোমুখি তাকিয়ে উলফাবাজী দিতে দিতে চলে গেলেন আসরের মাঝে। ২১ বার হাঁটু ঝাঁপ দিয়ে আবার পেছলিবাজী দিতে দিতে চলে এলেন আসরের দোরগোড়ায়। নিজস্ব ভঙ্গিমায় ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে এবারে শুরু করলেন শৈলী প্রদর্শনী।

রাজা তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে—চোখের পাতা পড়ে না, মুখে বাক্য সরেনা। প্রথমেই কেঁপে উঠল মুখোশের চূড়া টুকু, শরীরের অন্যান্য অংশ স্থির। একটু পরেই থরথর করে কাঁপতে শুরু হল মুখমণ্ডল। পরক্ষণেই ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে ওঠানামা করতে লাগলো কেবলমাত্র বক্ষস্থল। এরপর, দুলকী চালে রুমাল নেড়ে নেড়ে নাচ শুরু করলেন শিল্পী এক অত্যাশ্চর্য ভঙ্গিমায়। পায়ে রয়েছে ঘুঙুর জড়ানো, কিন্তু ঘুঙুর কিছুতেই বাজে না। হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো বেজেছে ঝমঝমিয়ে। আবার ঘুঙুর নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। এও কি সম্ভব! চারিদিক থেকে সহর্ষ অভিনন্দন ও করতালি দিয়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন হাজার হাজার দর্শক। রাজা বিস্ময়ে হতবাক, বাক্যহারা। এমন সাবলীল ভঙ্গি, এতখানি আত্মানিয়ন্ত্রণ এমন ছৌ জীবনে এর আগে তিনি তো কখনো দেখেননি—এ যে অনন্য, অসাধারণ, কল্পনাতীত, তুলনাহীন।

রাজা আর স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, ভাবলেন এই ছৌ নৃত্যের যাদুকরকে বুকে জড়িয়ে ধরে জীবন সার্থক করবেন। কিন্তু ফল হল উল্টো। রাজা উঠে দাঁড়াতেই লাফ দিয়ে আসর থেকে বেরিয়ে গেলেন শিল্পী। রাজা তৎক্ষণাৎ পার্ষদদের বললেন, ''দেখ, তো রে রাঁড়ীর বেটা গ্যোইমদা কোথায় গেল দেখ্।'' পরি মরি করে সকলে ছুটলেন, কিন্তু গ্যোইমদার যে দেখা নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে পাওয়া গেল সাজঘরে। একটা বাক্সের ভিতরে ঢুকে তিনি তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছেন। মন্ত্রী এসে বললেন, 'চল রাজামশাই তোমায় ডাকছেন।' এই কথা শুনে তিনি তো কাঁদতে লাগলেন। বললেন, ''হামি যাব নাই, রাজা হামাকে গুলি কইরবেক, হামি নাই জানি যে হামি রাজার প্রজা বটি, তাই আগুতলটাই পটকাঁয় হঁয়েঠি।'' মন্ত্রী তাকে যতই প্রবোধ দেন, ততই কান্না দ্বিগুন বাড়তে থাকে। শেষে একপ্রকার জোর করেই তাকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজাকে দেখতে পেয়েই তিনি লম্বালম্বি শুয়ে রাজার পা দুটি জড়িয়ে ধরেন। রাজা পরম স্নেহে মাটি থেকে তুলে তাকে বুকে টেনে নেন, হাতে ধরিয়ে দেন একটা গামছার পুঁটলি। তাতে বাঁধা এক সের রসগোল্লা। একসঙ্গে এতগুলো মিষ্টি পাওয়ায় তার আনন্দ আর ধরে না। তার নিজের কথায় ''হামি চাইটতে চাইটতে বাইরালি আসরলে। তো হাঁস ডিম মুরগী ডিম যে এত সুয়াদ ইয়ার আগে কনহ্দিনও জানথি নাই।'' ঘরে গিয়ে মিষ্টির গাঁটটা মাকে ধরিয়ে দিতেই তার ভুল ভেঙ্গে যায়। মা বললেন 'ইগুলা ডিম লয়েক, ইগুলা বটে রসগোল্লা— পিঠাগোল্লা''। পরের দিনও রাণীমাতার অনুরোধে তাকে রাজবাড়ীতে নাচতে হয়। এরপর থেকে দুঃখী মায়ের নয়নের নিধি 'বাবু' হলেন 'গ্যোইমদা', পরে 'গ্যোইমরা' এবং আরও পরে গম্ভীর সিং মুড়া।

গম্ভীর সিং-এর পিতা হলেন জিপা সিং এবং মাতা ফুলমণি। পিতার সঙ্গে গম্ভীর সিং-এর দেখা হয়নি অবশ্য কখনো। তিনি যখন মাতৃগর্ভজাত চার মাসের শিশু তখনই জিপা সিং হঠাৎ মারা যান। জিপা সিং -রা ছিলেন তিনভাই। জমি জমা একপ্রকার ছিলনা বললেই চলে। ২৫ সালের আকালে জিপা সিং-এর দুই ভাই চুনু সিং ও নুনু সিং আসামে জন্ খাটতে যান। তারও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর প্রবল আপত্তি এবং স্ত্রী ফুলমণির প্রগাঢ় ভালোবাসার কারণে কামরূপ কামাক্ষ্যার মোহিনীদের দেশে (প্রচলিত বিশ্বাস) তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যাইহোক জিপা সিং ছিলেন খুব উঁচুদরের ছৌ শিল্পী এবং নিজের গ্রাম চড়িদাতেই তার ছৌ নাচের দল ছিল। ওস্তাদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় তিনি ছৌ নাচের শিক্ষা দিতে যেতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মধু রায়, লাল মাহাত, কলেবর কুমার প্রমুখ। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন ছৌ নৃত্যের জগতে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। গম্ভীর সিং এদের প্রত্যেককেই আজীবন গুরুর সম্মান দিয়ে এসেছেন।

এবার জিপা সিং উপর গুগুই গ্রামে শিক্ষা দিয়ে নগদ ৬০ টাকা গুরুদক্ষিণা পেয়েছিলেন। তখনকার দিনে ৬০ টাকার মূল্য অনেক। বাড়ী ফিরে স্ত্রী ফুলমণির হাতে সমস্ত টাকাটা তুলে দিয়ে তার থেকে ১টাকা চেয়ে নিয়ে পাশেরই এক ভূমিজ বাড়ীতে চলে যান হাঁড়িয়া খেতে। কয়েকটি হাঁড়ির মধ্যে একটি হাঁড়ির হাঁড়িয়া তৈরী করা হয়েছিল কোন এক বিশেষ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মদ পড়ে যায় জিপা সিং-এর গ্লাসে। তাতে মেশানো ছিল তীব্র বিষ। খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তীব্র যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে থাকেন এবং পরদিনই মারা যান। গম্ভীর সিং এর অসহায় মা বাধ্য হয়ে চলে যান পিত্রালয়ে, বাগমুণ্ডী থানার অন্তগর্ত অযোধ্যা অঞ্চলের পিটিদিরি গ্রামে। সেখানে অর্থাৎ মামা বাড়ীতেই ১৩৩২ সালের ১৮ই ফাল্গুন (ইং ৫/৩/ ১৯২৬) জন্ম হয় গম্ভীর সিং-এর। গম্ভীর সিং এর এক দাদা ছিলেন। তাঁর নাম কমলাকান্ত। জন্মাবধি তিনি চোখে একটু ঝাপসা দেখতেন। গম্ভীর সিং এর স্ত্রীর নাম চিন্তামণি। তাঁদের তিন ছেলে— কার্ত্তিক, গণেশ ও পরশুরাম এবং দুই মেয়ে— বিবি ও বুড়ী।

মামাবাড়ীতে ৫-৬ বছর থাকার পর গম্ভীর সিং এর মা তাদের দু-ভাইকে নিয়ে চলে আসেন চড়িদা গ্রামে স্বামীর ভিটায়। কিন্তু জমি জমা না থাকায় সংসার চালানো বড় দায় হয়ে পড়ে। অভাগিনী মা এর ওর বাড়ীতে কাজ করে কখনো বা ভিক্ষে করে প্রতিপালন করতে থাকেন শিশুদ্বয়কে। শেষে অবস্থা চরমে পৌঁয়ায়। তাদের এই দৈন্যদশা দেখে পিতৃহারা গম্ভীর সিং মাকে একদিন বলেন, ''মা তুঁই হামাকে মানুষ কর, বড় হঁয়ে দেখিস, ঠিক তোকে সুখ দিবই।' 'দুঃখিনী মা কেঁদে বলেন, ''কি ক্যইরে মানুষ কইরব বাছা, হামার গায়ে যে একটা ট্যানাও জুইটছে নাই।'' অগত্যা মাত্র ৭-৮ বছর বয়সে গোরু গতানি (বাগালি বা মাঠে চরানোর দায়িত্ব) নিতে হয় গম্ভীর সিং-কে। স্কুলের চৌকাঠ মাড়ানোর সৌভাগ্য তার জীবনে ঘটেনি।

প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠে গ্রামের প্রায় ৭০-৮০ খানা গোরু নিয়ে দাদার সঙ্গে তিনি চলে যেতেন গভীর জঙ্গলে। সন্ধ্যের আগেই তাদের নিয়ে আবার ফিরে আসতেন ঘরে। এরই মধ্যে একদিন সূত্রধরদের একটি গাভী বনে সন্তান প্রসব করলে গম্ভীর সিং সদ্যজাত বাছুরটিকে কাঁদে নিয়ে গাভীসহ পৌঁছে দেন তার মালিকের কাছে। এতে গাভীর মালিক আনন্দিত হয়ে পুরস্কারস্বরূপ দুটি ৮-হাতি গামছা উপহার দেন। অভাবনীয়ভাবে দুঃখিনী মায়ের লজ্জা নিবারণের উপায় বের হয়ে যায়। এই গাভীমাতাটি ছিল গম্ভীর সিং এর খুব প্রিয় এবং আদি বা প্রথম শিক্ষাগুরু।

জঙ্গলের মধ্যেই ছিল একটা মস্ত আমগাছ। সেই গাছের নীচে গাভীটির বিশ্রামের জন্য তিনি একটি জায়গা পরিষ্কার করে

দিয়েছিলেন। গোরুগুলি বনে চরতে দিয়ে তিনি গাছের ডালে চড়ে বসতেন এবং নিজের হাতে তৈরী বনবাঁশের বেণুতে সুর ভাঁজতেন। কখনো বা খিদে পেলে শালপাতার ঠোঙায় দোহন করে সেই কামধেনুর দুধ পান করতেন। বাচ্চা প্রসব করা গাভীটি ছিল খুব রাগী স্বভাবের। কোন জন্তুকেই সে বাচ্চাটির কাছে ঘেঁসতে দিতনা। চোখে পড়ামাত্র শিং উঁচিয়ে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যেত বহুদূরে। আবার এসে আদর করত বাছুরটিকে। কখনো বা চার পা ছুঁড়ে, ঘাড় দুলিয়ে লেজটি তুলে খেলা করত বাচ্চাটির সঙ্গে। শুন্‌শান্ জঙ্গলের গাছের ডালে বসে গম্ভীর সিং এগুলি নিরীক্ষণ করতেন, অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতেন এবং এগুলি একাগ্রচিত্তে অনুশীলন করতেন। এইভাবে ছৌনৃত্যের প্রথম পা তার শুরু হয় গাভীমাতার কাছ থেকেই।

এরপর থেকে গর্গ মুনির মতো অরণ্যের বিভিন্ন পশুপক্ষীকে গম্ভীর সিং বসান গুরুর আসনে। লক্ষ্য করতে থাকেন আকাশে মেঘ উঠলে ময়ূর কেমনভাবে পেখম মেলে নাচে—তা দেখে ময়ূরী কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় দেখেছেন বানর, হনুমান, সিম্পাঞ্জী প্রভৃতি নরাকার পশুর দলকে ডিগ্‌বাজী দিতে দিতে ছুটাছুটি করতে। কখনো দেখেছেন জাম্বুবান দু-পায়ে ভর দিয়ে আনন্দে নৃত্য করছে। শিকার ধরার অপেক্ষায় অজগর কেমনভাবে আত্মগোপন করে রয়েছে। মৃদু - মন্থর গতিতে গজেন্দ্রর পাল যখন প্রায় সম্মুখ দিয়ে চলে যেত তিনি গম্ভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন। কদাচিৎ চোখে পড়েছে দুর্গম অরণ্যে কিভাবে একটা বাঘ শিকার ধরছে, কেমন তার গতিবিধি, কেমন তার ঝাঁপ, কেমনই বা পদসঞ্চার।

একবার তার পালেরই একটি গোরুকে বাঘে ধরেছিল। রাখাল গম্ভীর সিং লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন অদূরেই। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই ৮ বছরের শিশু দৌড়ে গিয়ে বাঘের গায়ে সজোরে বসিয়ে দেয় শক্ত বাঁশের লাঠিটা। বাঘটা গর্জন করে উঠতেই চৈতন্য হয়, মুহূর্তের মধ্যে পালিয়ে আসেন, বরাত জোরে বেঁচে যায় পিতৃদত্ত প্রাণটা। এইসব অভিজ্ঞতা তার কর্মময় জীবনে বিরাট কাজে লেগেছে। না, বন্য পশুরা কখনোই তার কোন অনিষ্ট করেনি, বরং তারা তার বাঁশীর সুর অনেকসময় মুগ্ধ হয়ে শুনতো। তাছাড়া তার পিঠভর্তি ঝাঁকড়া চুল থাকায় পশুরা হয়তো বা তাকে তাদের পরিবারেরই একজন বলে ধরে নিয়েছিল।

ছৌ নৃত্যের জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে এবং হাতে ধরে গম্ভীর সিংকে শেখানোর ব্যাপারে যে ব্যক্তিটির সবচেয়ে বেশী অবদান রয়েছে তিনি হলেন তাঁরই বড় ভাই কমলাকান্ত সিং মুড়া। এছাড়াও তাঁর জীবনে বিজয়চন্দ্র রায়, সহদেব গড়াই, সুচাঁদ সূত্রধর, গোলাম মহম্মদ প্রভৃতি ব্যক্তির সাহায্য সহযোগিতার কথা অস্বীকার করা যায়না।

অল্পকালের মধ্যেই শুধু নাচিয়ে হিসাবেই নয়, একজন করিতকর্মা ছেলে হিসাবেও গম্ভীর সিং-র নাম ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের গ্রামে। তার মা এবং কাকা বিয়ের তোড়জোড় শুরু করে দেন। বিয়ের নাম শুনেই লাজুক ছেলেটি পালিয়ে যান চাণ্ডিলের নিকটবর্তী শিকরা গ্রামে এবং সেখানে নাচের শিক্ষা দিতে থাকেন। প্রায় মাসখানেক খোঁজাখুঁজির পর সেখান থেকে তাতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় এবং গ্রামেরই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঝুলন সিং মুড়ার মেয়ে চিন্তামণির সাথে তার বিয়ে দেওয়া হয়।

সংসারী গম্ভীর সিং এবার গ্রামের ছেলেদের নিয়ে একটা দল গঠন করেন। অল্পকালের মধ্যেই এই দলের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ ব'সরেই চড়িদা গ্রামে শিবমণ্ডপে একটি ছৌ নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় তিন - চারটি দলকে নিয়ে। বারবেলায় ঐ আসরে বাবু ছৌ পরিবেশন করেন গম্ভীর সিং। ''বাবু পান খেয়েছে, বিধুমুখী পাগল হয়েছে''—মনমাতানো এই গানের সুরে নাচ দেখান তিনি। সেদিন শুধু বিধুমুখী কেন, কে না পাগল হয়েছিল গম্ভীর সিং-এর নাচ দেখে? তাইতো শ্রেষ্ঠ নাচিয়ের পুরস্কারস্বরূপ টাকার মালাটা সেদিন উপহার পেয়েছিলেন তিনিই।

আর একবার ভিন্ গ্রামে গম্ভীর সিং এর দল নাচতে যায়। সেখানে তিনি একটি অভাবনীয় কাণ্ড করে বসেন। সেদিন তিনি মহিষাসুরের ভূমিকায়। সেকি বীরত্বব্যঞ্জক আস্ফালন, মনে হয় যে পদভারে পৃথিবী পাতালে ঢুকে যাবে। একটু পরেই মহিষের রূপ ধরে দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ। মহিষের মুণ্ডু ছেদন করতেই অসুররূপী গম্ভীর সিং বেরিয়ে বুকের উপর ভর দিয়ে সর্পিল গতিতে এগিয়ে আসতে থাকেন দুর্গার দিকে। সকলেই সামনের দিকে এসে এ দৃশ্য দেখতে চায়, হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আসরের পিছনের সারি সারি মাচার ওপরে বসে ছিলেন সম্ভ্রান্ত বাড়ীর বৌ-ঝিরা। তারাও সকলে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে চায়। ফল হয় বিপরীত। ভারের ভারসাম্য হারিয়ে একটি মাচা মড়মড় করে ভেঙে পড়ে মাটিতে। এর পর থেকে তিনি পরিচিত হন 'মাচাভাঙা ওস্তাদ গম্ভীর সিং' নামে। এইভাবে তার ছৌ নৃত্যরূপী বিজয় রথের চাকা দুর্বার গতিতে ছুটে চলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে নগরে, ভারত হতে বহির্বিশ্বে।

এদিকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিমবঙ্গের Folk Culture Society-র অধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাগমুণ্ডীর মাঠাতে এসে পৌঁছান এবং চারদিন ধরে তিনি প্রায় ৪০টি দলের নাচ দেখেন। এর মধ্যে ওস্তাদ কলেবর কুমার ও ওস্তাদ গম্ভীর সিং— এই দুটি দল থেকে তিনি মোট ১৭ জন শিল্পী নির্বাচন করেন এবং ঐ শিল্পীদের নিয়ে ১৯৭২ সালে ১৭ই মে প্রথমে ইউরোপ যাত্রা করেন। তাঁদের পথপ্রদর্শক এবং যোগাযোগকারী ছিলেন একজন ফরাসী মহিলা, মিসেস মিলেনা সলভেনী। আকাশপথে তাঁরা পৌঁছান লণ্ডন শহরে। লণ্ডনের আভিজাত্য, রং-বেরঙ এর গাড়ী এবং কত নাম না জানা ফুলের সৌন্দর্য দেখে তারা বিভোর হয়ে যান। এখানে প্রথম ছৌ নাচ অনুষ্ঠিত হয় ২২শে মে স্যাডলার ওয়েলস্ থিয়েটারে। প্রথম দিন নাচ দেখেই ব্রিটেনের মানুষ অভিভূত হয়ে যান। অনুষ্ঠান শেষে বহু মানুষ শিল্পীদের সাথে করমর্দন করতে আসেন এবং তাদেরকে ইংরেজীতে কিছু জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু শিল্পীরা ইংরেজী জানতেন না বলে কখনো ইয়েস ইয়েস, কখনো নো নো বলে উত্তর দিতে থাকন। ২৫ শে মে বি. বি. সি. টেলিভিশনে সারা দেশের মানুষ ছৌ নাচ দর্শন করেন।

লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে ১৫ দিন ধরে ছৌনৃত্যের অনুষ্ঠান করে শিল্পীরা আসেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। এখানেও ১৫ দিন নাচ হয় এবং শিল্পীরা সেদেশের মানুষের উষ্ণ অভিনন্দন লাভ করেন। তদানীন্তন ফরাসী প্রেসিডেন্ট ছৌ নৃত্য দেখে অত্যন্ত খুশী হন এবং নৃত্য শিল্পীদের নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান ও উপহার দেন।

১৮ই জুন ১৯৭২ প্যারিস থেকে পুরুলিয়ার ছৌ নাচ পৌঁছে যায় হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টারডামে। ১৯শে জুন সেখানে অনুষ্ঠান হয়। সেদেশের মানুষও ছৌ নাচকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

হল্যাণ্ড থেকে ছৌ শিল্পীরা আসেন স্পেনে। সেখানকার রুক্ষ অনুর্বর মাটি দেখে তারা দেশটিকে পুরুলিয়ারই কোন অঞ্চল বলে প্রথমে মনে করেন। স্পেনের রাজদানী মাদ্রিদ সহ বিভিন্ন শহরে সাতদিন ধরে নাচ হয়। নাচ শেষ করে শিল্পীরা যখন দেশে ফেরার জন্য বিমানবন্দরে আসেন তখন দুঃখের ছায়া ঘনিয়ে আসে। কারণ মাতৃস্বরূপিনী শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা মিলেনা সলভেনী যিনি প্রায় দু-মাস ছিলেন তাদের সুখ - দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গিনী তাকে এবার ছেড়ে যেতে হবে, হয়তো বা জীবনে কোনদিনও আর দেখাও হবেনা। বিমানবন্দরে ১৯জন (১৭+২ কলিকাতা) কালো মানুষের সঙ্গে একজন সাদা চামড়ার মহিলার কান্না দেখে স্পেনের হাজার হাজার মানুষ বুঝতে পারেন ছৌ শিল্পীরা বিদেশিনীর হৃদয় কতখানি দখল করে নিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালে ১৬ই জানুয়ারী পুরুলিয়া ছৌ শিল্পীরা মার্কিন মুলুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং কলকাতা থেকে বোম্বাই হয়ে তাঁরা আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন পৌঁছান। সেখান থেকে আসেন নিউইয়র্কে। নিউইয়র্কের সৌন্দর্য এবং বৃহৎ অট্টালিকা দেখে শিল্পীরা অবাক হয়ে যান। এখানে পরপর ২দিন নাচ হয়। তারপর তাঁরা আসেন কানাডার টরেন্টো শহরে। সেখানেও নাচ হয় ২দিন। এরপর বস্টন শহরে ৪দিন, পিটস্‌বার্গ শহরে ৫দিন, ক্যালিফোর্ণিয়ায় ৬দিন, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ২দিন এবং হনলুলুতে ২দিন অনুষ্ঠান

করে শিল্পীরা বাড়ী ফেরেন। উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকাতে শিল্পীরা সবচেয়ে বেশী সম্মান পেয়েছিলেন এবং সেদেশের মানুষের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতির নম্র ব্যবহারে তারা মুগ্ধ হয়ে যান। এছাড়া প্রবাসী ভারতীয়দের হৃদ্যতা, মহানুভবতা ও সদ্ব্যবহারে শিল্পীরা ঘৃণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি যে, তারা বিদেশে আছেন। এখানে তারা সোনার থালা সহ প্রচুর উপহার পেয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালে আমেরিকা থেকে ফেরার পর আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে গম্ভীর সিং-এর মনোমালিন্য ঘটে এবং কলেবর কুমার ও গম্ভীর সিং -এর দল আলাদা হয়ে যায়। এর পরবর্তীকালে একসাথে নয়, দুটি দলই পৃথক পৃথক ভাবে বিলাত যাত্রা করতে থাকে। যাইহোক ১৯৮৬ সালে ফ্রান্সে ভারতীয় উৎসবে গম্ভীর সিং-এর একক দল যোগদান করে এবং কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রাখে।

১৯৯১ সালে গম্ভীর সিং এর দল এককভাবে জাপানে আমন্ত্রিত হয় এবং জাপানের রাজধানী টোকিওতে নৃত্য প্রদর্শন করে। সেখান থেকে আসেন সিঙ্গাপুরে। এখানেও অনুষ্ঠান হয়। শিল্পীরা গভীরভাবে সমাদৃত হন এবং আপ্যায়িত হন। তারপর তারা দেশে ফিরে আসেন। পুরুলিয়ার ছৌ নাচ বিশ্বের দরবারে আমন্ত্রিত হওয়ার পর থেকেই বিশ্বসংস্কৃতিতে ভারত নিজের স্থান করে নিয়েছে কুলীনের পংক্তিতে— এটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে অত্যন্ত আনন্দের, গৌরবের এবং মর্যাদার বিষয়।

অবশ্য সারা পৃথিবী জুড়ে নৃত্য প্রদর্শন করে শিল্পীদের যে অর্থ পাওয়া উচিত ছিল তার সামান্য অংশই তারা পেয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গাতে তাঁরা যে অজস্র উপহার পেয়েছিলেন শিল্পীদের কথায় 'সেগুলি এখন শোভা পাচ্ছে আশুবাবুর বেহালার বাড়ীতে।"

পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হওয়ায় ভারত সরকারের কর্তাব্যক্তিরা ছৌ নৃত্য দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাই ১৯৭৫ সালে দিল্লীর বিড়লা স্টেডিয়ামে শেরাইকেলার ছৌ নাচ (বিহার), ময়ূরভঞ্জের ছৌ নাচ (উড়িষ্যা) এবং পুরুলিয়ার ছৌ নাচ (পশ্চিমবঙ্গ) প্রতিযোগিতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীসহ গণ্যমান্য অতিথিবর্গ। তারা সকলেই পুরুলিয়ার ছৌ নাচ দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৮১ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি ছৌ দলের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে গম্ভীর সিং-কে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেন। বাগমুণ্ডীর চড়িদা গ্রামের জিপা সিং ও ফুলমণির 'বাবু' এবার থেকে হলেন ''পদ্মশ্রী'' গম্ভীর সিং। বাল্যকালে মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সুখ দেবেন। হায় অভাগী ফুলমণি, আজ যদি তুমি বেঁচে থাকতে কতই না সুখ পেতে।

পরের বছর ১৯৮২ সালে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান তথা বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তোলার জন্য ভারত সরকারের তরফ থেকে গম্ভীর সিংকে 'সংগীত নাটক একাডেমি' পুরস্কার প্রদান করা হয়। স্মারকপত্র সহ একটি পাঁচ হাঁজার টাকার চেক তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঐ চেকটি ভাঙাতে গেলে অফিসের বড়বাবু তাঁর কাছে ছয় শত টাকা ঘুষ চেয়ে বসেন। গম্ভীর সিং এতে ক্ষেপে যান এবং স্পষ্টভাষায় বলেন, ''রাড়ীর বেটা গ্যোইমদা কাকেই কন্হ দিন টাকা দিয়ে কোন কাজ করে নাই, আর করবেক নাই।" তারপর ঐ চেকটি অফিসের দেয়ালের গোবর লেপন করে সেঁটে দিয়ে ছেলেকে নিয়ে সোজা বাড়ী চলে আসেন। হুলুস্থুল কাণ্ড পড়ে যায়। শেষে অফিসের ঐ ঘুষ চাওয়া বাবু পায়ে ধরে ক্ষমা চান এবং নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

ছৌ নৃত্যকে কেন্দ্র করেই যদিও গম্ভীর সিং-এর বিশ্বব্যাপী পরিচিতি তাহলেও তাঁর জীবনের অন্যান্য দিকগুলি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। অত্যন্ত সাধাসিধে, সরল প্রকৃতির, হাস্যরসাত্মক, কৌতুকপ্রিয়, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা, বেঁটে খাটো, টাঙ্গির মত গোঁফবিশিষ্ট এই মানুষটি ছিলেন সবেতেই অনন্য। অতি মধুর সুরে তিনি যেমন বাঁশী বাজাতে পারতেন, তেমনি ঢোল, ধামসা, কেঁদারি, টুইলা প্রভৃতি যন্ত্রেও তার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই মানুষটি তির ধনুকে ছিল অব্যর্থ নিশানা। শর নিক্ষেপ করে পুকুরের মাছ শিকারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। লাঠি খেলা এবং কুস্তিতেও তিনি ছিলেন পাকা। অবসর সময়ে বাড়ীতে বসেই তিনি কবিরাজী টোটকা চিকিৎসা করতেন। বুড়ো বয়সেও বাচ্চাদের সঙ্গে ঠাট্টা, তামাসা ও খেলা করতে ভালোবাসতেন।

লেখাপড়া না জানলে ও গম্ভীর সিং - এর মর্যাদাজ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রবল। বিছানা পাতা থাকলেও নিজের হাতে না ঝেড়ে সেই বিছানায় তিনি কখনো বসতেন না। কারো সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলতেন না। এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতেন না। রাজনীতিতে তাঁর অনীহা ছিল। একবার তাকে ভোটে দাঁড়ানোর জন্য একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে খুব জেদাজেদি করা হয়েছিল। দাঁড়ালে হয়তো তিনি অনায়াসে জিততেও পারতেন। কিন্তু নিরক্ষর হলেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এতে তার স্বাধীন সত্তা হারিয়ে যাবে— তাই লোভের পথে পা বাড়াননি। পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন, ''শুন ভাই, নাচে যাঁইয়ে হামাকে পেরায়েই ঘরছাড়া হঁয়ে থাইকতে হয়। ঘরে আসিয়ে লোকে হামাকে যখন পাবেক নাই, ঘুরিয়ে যাবেক, তখন কেউ কাত্তিকের মা কে লিবেক, কেউ গণেশের, কেউ লিবেক পরশুরামের—শালার গ্যোইমরা ইটা সইতে লারবেক।"

প্রায়শই গম্ভীর সিং-এর কাছে দেশ - বিদেশের পর্যটক, গবেষণারত ছাত্র - ছাত্রী, রেডিও - টি.ভি.-র লোকেরা আসতেন, সাক্ষাৎকার নিতেন, রেকর্ডিং করতেন, ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতির পাহাড় রচনা করতেন। তারপর নিজেদের বৃত্তে গিয়ে সকলেই এই দরিদ্র শিল্পীর কথা বেমালুম ভুলে যেতেন। জীবদ্দশায় কোন সরকারী সাহায্য তিনি পাননি। এখন অবশ্য তার পরিবারের আর ভাতের অভাব নেই। নিজের হাতে তৈরী করা জমিতে প্রায় ১৪-১৫ মণ ধানের বীজ পড়ে।

অন্তিমলগ্ন ঃ-

শেষ বয়সেও গম্ভীর সিং -এরর প্রিয় শখ ছিল গোরু চরানো এবং কামধেনুর কাছে শেখা নাচ অনুশীলন করা। তবে শরীরে আর কুলোতনা, মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে আসত। তাছাড়া চোখেও দেখতেন ঝাপসা। তাই ঠিক হয় কলকাতায় গিয়ে চোখের ছানি অপারেশন করাবেন। ব্যবস্থাও হয়ে যায় তাঁরই কাছে তালিম নিতে আসা কলকাতার এক নাটক দলের উদ্যোগে। ১লা নভেম্বর ২০০২ তাঁকে বেলঘরিয়ার একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। অপারেশন যথাসময়ে হয় এবং প্রায় সুস্থ হয়ে বাড়ী ফেরার জন্য ৯ই ডিসেম্বর হাওড়া - চক্রধরপুর ট্রেনে চড়ে বসেন। সঙ্গে ছিলেন বড় ছেলে কার্ত্তিক ও জামাতা ফুলচাঁদ। বাঁকুড়া পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। তারপর কখন যেন তাঁর হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় তা কেউই টের পায়নি। পুরুলিয়াতে ডাকাডাকি করতে গেলে বোঝা যায় যে, তিনি প্রয়াত হয়েছেন। কান্নায় ভেঙে পড়েন ছেলে ও জামাতা। ট্রেন বরাভূম স্টেশনে পৌঁছালে প্রায় আধঘন্টা দাঁড়িয়ে তাকে। শিল্পীর মরদেহ ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে আসা হয় নিজের গ্রামে চড়িদাতে এবং সেখানেই ২৩শে কার্ত্তিক ১৮০৯ (ইং ১০/১১/২০০২) তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। রেডিও, টি.ভি. সংবাদপত্রে এই খবর প্রচারিত হলে সারা দেশ তথা বিশ্বের মানুষ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

প্রয়াত ছৌ শিল্পী পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং কে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর স্মৃতিকে জিইয়ে রাখার জন্য যে তমালতলে তিনি বা তাঁর দল নাচের অনুশীলন করতেন সেখানে তাঁর একটি পূর্ণাবয়ম মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। মূর্তিটি নির্মাণ করেছেন এলাকারই বিশিষ্ট ভাস্কর্য শিল্পী 'রাম'। তাছাড়া সাংসদ বীর সিং মাহাত মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে সেখানেই নির্মিত হয়েছে একটি কমিউনিটি হল। এলাকার জনগণের প্রত্যাশা এবং দাবী এখানে একটি ছৌ নৃত্য একাডেমি গঠন করার এবং এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে সকাতর আবেদনও জানানো হয়েছে। অনন্য শিল্পীর অনন্য প্রতিভাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ছৌ নাচ ছড়িয়ে দিতে শ্রমিক - কৃষক খেটে খাওয়া মানুষের দলের মুখ্যমন্ত্রী অনন্য ভূমিকা পালন করবেন বলেই এলাকার মানুষের বিশ্বাস।